নইপল ঃ ‘নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে’

রমা কুন্ডু

“ঘরের সন্ধানী তুমি ঘর পাইলা না .....”
(শম্ভু মিত্র, চাঁদ বণিকের পালা)

“What are the roots that clutch?”
(T.S. Eliot, The Waste Land)

গ্র্যাহাম গ্রীন-এর The Comedians উপন্যাসে এক তণ— তার দেশ নেই, বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই—ভাবে ঃ

কত মানুষ আছে যারা জন্মসূত্রে কোনো না কোনো দেশের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বাঁধনে জড়িয়ে থাকে। এমনকি যখন তারা দেশ ছেড়ে চলে যায় তখনও কোনো এক টান তাদের অনুভবে থেকে যায়। কত না মানুষ কোনো না কোনো প্রদেশ, দেশ, গ্রামকে তার নিজস্ব জায়গা বলে ভাবতে পারে, কিন্তু আমি কোথাও কোনো যোগ অনুভব করি না .... ; অস্থায়িতা, অস্থিরতাই আমার জীবনের রং, আমার শিকড় কখনো এত গভীরে নামে না যে আমি একটা ঘর গড়তে পারি, কিংবা ভালবাসায় থিতু হতে পারি।

Brown- এর কথায় ফুটে ওঠে চিরন্তন পরবাসীর মর্মবেদনা — সে পরবাসী খুঁজে ফেরে শিকড়, এমন শিকড় যা মাটিকে আঁকড়ে ধরবে—কিন্তু পায় না।

নানা কারণে স্বভূমি থেকে উৎপাটিত লেখকেরা নিজেদের পরবাসী অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন আবহমানকাল। স্মরণ করা যেতে পারে কৃষ্ণসাগরের কূলে ওভিদের নির্বাসনের বছরগুলিতে লেখা কবিতা ও চিঠি — বিচ্ছিন্নতার বেদনায় আচ্ছন্ন। দান্তে থেকে সুইফ্‌ট্‌, হাইনে, হবাগ্‌নার প্রমুখ লেখকেরা শিল্পসৃজন করেছেন পরবাস অভিজ্ঞতার নির্যাস দিয়ে। গত শতকে টমাস মান, ব্রেশট, মুজিল, স্তেপান জ্যুইগ-এর মত যাঁদের জার্মানি ছাড়তে হয়েছিল ৩০-এর দশকে, তাঁদের লেখাতেও নির্বাসিতের আত্মকথন। এ প্রসঙ্গে সোভিয়েত লেখকদের কথাও মনে পড়ে, যাঁদেরকে ১৯১৭ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত স্বভূমি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে বার বার; অথবা সেই সব চেক্‌ বুদ্ধিজীবীরা যাঁরা ১৯৬৮-র সোভিয়েত আক্রমণের সময় বিদেশে ছিলেন— তারপরে আর ঘরে ফেরা হয়নি; অথবা সেই সব চীনা লেখকেরা যাঁরা ১৯৮৯-এর জুনে তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারের ঘটনার পরে পশ্চিমে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আজকের সাহিত্যে নির্বাসন — বাধ্যতামূলক বা স্বেচ্ছাবৃত—ও তজ্জনিত নিঃসংগতা, শিকড়হীনতা এক ব্যাপ্ত বিষয়। গৃহহীন যাত্রী সাহিত্যে এক প্রাচীন প্রত্নপ্রতিমা; কিন্তু আজকের দিনে তা এক বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছে ।

এডওয়ার্ড সইদের কথায় ঃ

সব জাতীয়তাবাদের মধ্যে আছে ... তাদের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সীমানাচিহ্নগুলি, তাদের চিহ্নিত শত্রু ও বীরেরা। ... কালক্রমে সফল জাতীয়তাবাদে ধরে নেওয়া হয় যা কিছু সত্য তা আমাদের এবং যা কিছু মিথ্যা ও নিকৃষ্ট তা 'অপরের' (পুঁজিবাদী বনাম কম্যুনিষ্ট, ইউরোপীয় বনাম এশীয়—সেও এমনই যুক্তিধারা)। আর 'আমাদের' ও 'ওদের' ভিতরকার সীমান্তরেখার ঠিক পিছনেই আছে সেই বিপজ্জনক এলাকা যেখানে কারো জন্য ঘর নেই, গ্রহণ নেই। আদিমযুগে সমাজতাড়িত মানুষের এলাকা। আজকে যেখানে অসংখ্য মানুষ—উদ্বাস্তু উচ্ছিন্ন মানুষ দিকহারা ঘুরে বেড়ায় ।

এই রকমই এক একদা উচ্ছিন্ন মানবগোষ্ঠীর ইতিহাস ক্যারিবীয়ান দ্বীপপুঞ্জের পথে প্রান্তরে, আখের খেতে, সমুদ্রবেলায় পাওয়া যাবে। তারা একদিন আমাদের দেশ থেকেই ভেসেছিল। তাদের নাম ছিল " চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক"। উপনিবেশ-ইতিহাসের কয়েকটি রক্তাক্ত পৃষ্ঠায় ক্যারীব দ্বীপপুঞ্জের কয়েক শতকের ভীষণ অতীত লেখা আছে— আদি বাসিন্দা আরাওয়াক ও ক্যারীবদের গণহত্যা, ইউরোপীয় শক্তিগুলির নিজেদের মরীয়া লড়াই এক একটি দ্বীপের দখল নিয়ে— তারপরে এলো আখ চাষ— জর্জ লেসিং-এর ভাষায় 'ইক্ষু দানব'— আর তারই হাত ধরে আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস, পরবর্তী পর্যায়ে এশিয়া থেকে "চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক"। ১৯৩০/৪০-এ এসে এ অঞ্চল ইতিমধ্যেই এক বহু জনজাতি অধ্যুষিত দ্বীপমালা। তারা সবাই অনিচ্ছুক বাসিন্দা। তারা সবাই অন্য কোনো উৎসভূমির জন্য আকুল। এরা সবাই কণভাবে আঁকড়ে ধরতে চায় অন্য কোনো সাংস্কৃতিক বিশুদ্ধতা ও বিধিনিয়ম। বস্তুত যে ভূমিতে তারা এসে পড়েছে তার যেন কোন ইতিহাস নেই, নেই কোনো প্রাচীন ধূসর স্মৃতিরণিত ঐতিহ্যবাহিত গল্পমালা; চারিদিকে উচ্ছসিত সমুদ্রের প্রতিটি ঢেউ এসে তাদের সাবেক আত্মপরিচয়টুকু মুছে মুছে দিচ্ছে। এই অবস্থায় স্থানীয় লেখকের পক্ষে খুব বড় একটা চ্যালেঞ্জ ছিল এই শূন্যতার মধ্যে বসে সৃজনের কাজ করা একটা কোনো উপযুক্ত মানসিক পরিকাঠামো তৈরী করা যাতে সে নির্বাসিত জনজাতির শিকড় সন্ধান একটা রূপ পায়, একটা আত্মপরিচয়ে পৌঁছানো যায়। সাম্প্রতিক নোবেলবিজয়ী নইপলের সাহিত্যকর্ম—তার টানাপোড়েন, সাফল্য-অসাফল্য, উৎকাঙক্ষা-উৎকেন্দ্রিকতাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে কিছুটা বোঝা যেতে পারে।

এডওয়ার্ড সইদ তাঁর সাম্প্রতিক বই Reflections of Exile-এ শিরোনাম প্রবন্ধে লিখছেন ঃ

পরবাস (exile) হল এক অসহ বিচ্ছেদ—বিচ্ছেদ কোনো মানুষের সঙ্গে তার নিজস্ব জায়গার, বিচ্ছেদ মানুষের সঙ্গে তার আসল ঘরের; এর অসীম বিষাদ কখনো অতিক্রম করা যায় না। সত্য কথা, সাহিত্যে ও ইতিহাসে নির্বাসিতের জীবনের কোনো বীরত্বপূর্ণ, রোম্যান্টিক, গৌরবময়, এমনকি সাফল্যের ঘটনাও পাওয়া যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এগুলি বিছিন্নতার মর্মান্তিক দুঃখকে জয় করবার চেষ্টা মাত্র। নির্বাসিতের যা কিছু অর্জন তাকে কুরে কুরে ক্ষয় করে এক চেতনা, যা চিরকালের জন্য পিছনে ফেলে আসা হল সেই হারানোর চেতনা।"

ভারত ও ত্রিনিদাদ সম্পর্কে নইপলের বিতর্কিত, কখনো বিভ্রান্তিকর লেখা ও বিচিত্র বিবৃতি—কখনো আক্রমণাত্মক কখনো আবেগময় — আরো ভালোভাবে বোঝা যায় সইদ-এর চিন্তার আলোয়।

নোবেল প্রাইজ-এর খবর পেয়েই নইপল যে সংক্ষিপ্ত বিবৃতিটি দেন সেটি এই রকম ঃ
এ এক মহান অর্ঘ্য—অর্ঘ্য আমার দেশ ইংল্যান্ডের প্রতি, এবং অর্ঘ্য আমার পূর্বপুষের দেশ ভারতের প্রতি।

তিনি যে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তা হল [my] 'home'. আমাদের কাছে এ বিবৃতি এক সুন্দর বিস্ময় ছিল। কারণ অতীতে একাধিকবার নইপল ভারতকে নানাভাবে সমালোচনা করেছেন, 'অন্ধকারের এলাকা', 'আহত সভ্যতা' ইত্যাদি নানা পরিভাষায়। একদিকে যেমন তিনি ভারতীয় লেখকদের সাহিত্যকর্মকে নস্যাৎ করেছেন, অপরদিকে বিদেশী লেখক যাঁরা ভারত সম্পর্কে লিখেছেন, যেমন ফরস্টার, সমারসেট মম্, তাঁদেরও তীব্র সমালোচনা করেছেন এই বলে যে তাঁরা ভারত সম্পর্কে কিছু জানেননি, বোঝেননি। অথচ তাঁর ২০০১ সালে প্রকাশিত Halt a Life -এ মম্-এর ভারত-গ্রন্থ The

Razor's Edge -এর ছায়া স্পষ্ট। এ বই-এর একটি চরিত্রের জ্যান্ত সমারসেট মম্-এর সঙ্গেই দেখা হয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে সে তার ছেলের নাম রেখেছিল সমারসেট চন্দ্রন। আর নইপল-এর মতো একজন অনুভবী লেখক ফরস্টারের সৎ সংবেদনশীলতাকে বুঝবেন না, এও আশ্চর্য মনে হয় । তবে কি এই রূঢ় অস্বীকৃতির পিছনে কাজ করে কোনো জটিল মনস্তাত্ত্বিক কারণ—এমনই কোনো অভিমান যে এ দেশ তো আমার জানা, ওদের চাইতে অনেক বেশি জানা, এ বিষয়ে বলার অধিকার আমারই, ওদের চাইতে অনেক বেশী করে আমরই। তাই হয়ত অভিমানী বালকের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন নইপল, কখনো সুচির সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েও। ইউরোপীয় বা ব্রিটিশ কল্পনায় ভারত আকর্ষণীয় হতে পারে, কিন্তু ভারত সেখানে 'other' । সেই কারণেই হয়তো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন নইপল, কারণ তাঁর কাছে ভারত বাস্তব, সত্যি,—হতে পারে আহত অন্ধকারাচ্ছন্ন, বিদ্রোহ-দীর্ণ—তবু 'other' নয় ।

'Other' নয়। কিন্তু তবু ভারত তাঁর নিতান্ত বাড়ীও নয়। তেমনই ভারতীয় সাহিত্যেও তিনি পথ খুঁজে পান না, যেমন পান না ব্রিটিশ, ক্যারিবিয়ান সাহিত্যে; রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পথসন্ধান দেন না যেমন দেন না Golding বা Walcott. নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পরের দিন নইপল বলছেন ঃ

আমার লেখা আমার নিজের। আমাকে আমার পথ খুঁজে খুঁজে নিতে হয়েছে। আমি খুশী হতাম যদি আমি বলতে পারতাম আমি অমুক ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত, কিন্তু আমি তা নই।

এ কথার মধ্যে লেখকের কেন্দ্রিক সমস্যাটি ধরা পড়ে ঃ তিনি কোনো বিশেষ ঐতিহ্যের ভিতরে জন্মাতে পারেননি, যদিও এমন একটা আকাঙ্খা তাঁর ভিতরে থেকে গেছে। হয়তো সে গভীর তীব্র আকাঙ্খাকে কোনোদিনই তিনি পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারেননি।

সাংবাদিকরা যখন প্রশ্ন করে কেন তিনি তাঁর অর্ঘ্যে ত্রিনিদাদ-এর কথা বললেন না, নইপল উত্তর দিচ্ছেন ঃ

সত্যি কথা বলতে গত চল্লিশ বছর ধরে ভারতের প্রতি আমি বেশি টান বোধ করি।
বৌদ্ধিকভাবেও আমি ত্রিনিদাদের চাইতে সেখানেই (ভারতে) অনেক বেশী অবস্থান করি।
ঐ একই সাক্ষাৎকারে লেখক দাবী করছেন ভারত সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির, যা ভারত সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। তিনি বলছেন ঃ

আমি ভারতে অনেক কাজ করি। অনেক লোকের সঙ্গে কথা বলি। যখন আমি যাই শহরে বসে থাকি না, গ্রামে চলে যাই। ভারতকে আমি কিছুটা গভীরভাবে জানি।
শদির এক চমৎকার উক্তি এ প্সঙ্গে উল্লেখ করা যায়। Diaspora - কে তিনি সংজ্ঞায়িত করেন এ যেন এক ভাঙা আয়না যার কিছু টুকরো হারিয়ে গেছে, আর সেগুলিই খুঁজে ফেরা। নইপলের মধ্যে আমরা দেখতে পারি এক অভিমানী বালককে—সে বালক তার ভাঙা আয়নাটাকে ভুলতে পারে না— কখনো ক্ষোভে, কখনো ক্রোধে, কখনো হতাশায়, কখনো উজ্জ্বল তির্যক ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে— সে কেবলই খুঁজে ফেরে হারিয়ে যাওয়া টুকরোগুলি। হয়তো জোড়া দিতে পারলে এক অখণ্ড আত্মপরিচয়ের ছবি ফুটত আয়নায় ?

এই সূত্র থেকে বিশ্লেষণ করলে ত্রিনিদাদ সম্পর্কেও তাঁর ভাবনা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ছেলেবেলার দিনগুলিতেও বালক ভিদিয়া ত্রিনিদাদকে একটা স্বতন্ত্র স্বকীয় নিজভূমি ভাবতে শেখেনি। এমন একটা দ্বীপে সে জন্মেছিল ও বেড়ে উঠেছিল যাকে জনজাতি উপাদানের দিক থেকে দেখলে ভারতেই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যেতে পারত। আর একটু এগোলে পূর্বপুষদের ফেলে আসা সুদূর স্ব-ভূমির এক কণ হাস্যকর অনুকরণ প্রচেষ্টা। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এর সীমিততা, বদ্ধতা,

শুন্যতা বালককে পীড়িত করতে থাকে। "এমন এক সমাজ যার ধ্যান জ্ঞান শুধু চাষবাস আর টাকাপয়সা। তার আত্মিক জীবন থেমে গেছে। ধর্ম তার দর্শন হারিয়ে আচারসর্বস্ব অভ্যাস। এক সম্পূর্ণ বস্তুবাদী উপনিবেশ সমাজ ; ইতিহাসের এক দুর্ঘটনায় যার জন্ম। Patrick White অষ্ট্রেলিয়ার অভিবাসী সমাজের শূন্যতাবোধের কথা বলেছিলেন ঃ " The great Australian emptiness, in which the mind is the least of possessions." নইপলে যেন একই অনুভব পাওয়া যায় এবং White এর মতোই তিনিও এই উচ্ছিন্ন জীবনের বিশাল শূন্যতার দিকে ছুঁড়ে দেন তিক্ত-কষায় ব্যঙ্গ হাসির চাবুক। ১৯৫৪ সালে অক্সফোর্ড থেকে তণ ভিডিয়া মাকে লিখছেন ঃ " আমি ত্রিনিদাদের জীবনে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারব না। জায়গাটা বড্ড ছোট, মূল্যবোধগুলি সব ভুল, মানুষ বড় ক্ষুদ্র।" তারপরেই বলছেন "দাণ হত যদি ভারতে কোনো কাজের ব্যবস্থা করতে পারতাম...।"

শু থেকেই তাঁর মনের মধ্যে ভারত সম্পর্কে এক আগ্রহ জন্মেছিল, হয়তো এক কাল্পনিক ছবি। বাস্তব সংস্পর্শ নিশ্চয়ই পরবর্তী দিনে কিছুটা মোহভঙ্গের কারণ হয়েছিল ওফলত কিছু তিক্ততা যা বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়ে ভারত সম্পর্কে তাঁর 'ক্ষত', 'অন্ধকার', 'বিদ্রোহ'-র ছবিতে। তবু তিনি ভারতকে মন থেকে সরাতে পারেন না। তিনি উচচস্বরে ঘোষণা করতে পারেন তিনি কোনো দেশের প্রতিনিধি নন, তিনি 'বিশ্বের লেখক'। কিন্তু তিনি বারবার ভারতে ফিরে আসেন, —ব্যক্তিগত ভাবে, একজন প্রামাণিক হয়ে— আর কল্পনায় একজন লেখক হয়ে। নইপল-এর সর্বপ্রথম প্রকাশিত ও সাম্প্রতিকতম—এই দুটি উপন্যাস-এর দিকে তাকালেও বোঝা যায় কি নাছোড় সে টান যা লেখককে ভারতের কথা ভুলতে দেয় না। এ কোনো রোমান্টিক প্রেমিক-এর অন্ধ প্রেম নয়। এ এক কঠিন প্রেমিকের জটিল আবেগ— সে কখনো সমালোচনাশীল, কখনো উত্তাল, কখনো অভিমানী, কখনো এমনকি ঘৃণাপূর্ণ—কিন্তু তার অমনোযোগ নেই, ভুলে যাওয়া নেই। এ এক বাধ্যত নির্বাসিতের নাছোড় আবেগ তার পূর্বপুষের হারানো বসত-এর জন্য, ছিঁড়ে নেওয়া শিকড়ের জন্য।

আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশের কাছে নইপল তত প্রিয় নন। অশোক মিত্র-র তীব্র শ্লেষাত্মক আত্রমণ (The Telegraph, ২৬-১০-০১) -এর একটা দৃষ্টান্ত। অশোক মিত্র তাঁর প্রবন্ধেএকটা প্রস্তাবনা খাড়া করেন ঃ ধরা যাক আর. কে. নারায়ণ যদি মালগুডিকে ভুলে যেতেন তবে কেমন হত? কিন্তু এ আত্রমণের লক্ষ্যই ভ্রান্ত। কারণ সমালোচক খেয়াল করেন না যে নারায়ণ -এর অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন, তিনি নিজস্ব দেশের মাটিতে শিকড় নামিয়ে দিয়ে সুস্থিত। এইখানে তাঁর আবাস (belonging) । নইপল-এর কাছে ত্রিনিদাদ তো সে আবাস নয়। অথচ ভারতও নয়। ভারত তাঁর পূর্বপুষের বাড়ী, কিন্তু তাঁর তো আর বাড়ী নয়। A Way in the World (১৯৯৪)-এ নইপল বলছেন ঃ "আমরা সবাই এক একটা জগতের ধারণা তৈরি করে নিয়ে তার মধ্যে বসবাস করি। প্রাচীন কালের মানুষদের এরকম নিজস্ব জগৎ ছিল। আমাদের পিতামহদের ছিল। আমরা তাদের সেই নির্মাণ (construct) -এর মধ্যে ঢুকে গিয়ে বসবাস করতে পারি না।" এটাই তাঁর চ্যালেঞ্জ । অন্তরে বাহিরে নির্বাসিত লেখককে নতুন করে নির্মাণ করতে হয়েছে তাঁর জগৎ। তাঁর বিশাল সাহিত্যকর্মের মধ্যে এই নির্মাণের ভাঙা-গড়া, ফিরে ভাঙা চলেছে অবিরাম। কিন্তু নির্মাণ-এর কেন্দ্রে যে বারবার এসে দাঁড়িয়েছে, অথবা যাকে ঘিরে চলেছে এ নির্মাণ, সে একজন অস্থির- অস্থিত-ভাসমান- বিছিন্ন— মানুষ কখনো তাকে মনে হয় হাস্যকর, কখনো ট্র্যাজিক, কখনো দুর্বোধ্য। পৃথিবীর নানা প্রান্তে তাদের সঙ্গে দেখা হয় পাঠকদের । বিচিত্র ও স্বতন্ত্র তাদের পরিস্থিতি-অভিজ্ঞতা- অনুভব। তবু কোনো একটা সূত্র তাদের ভিতরে রয়ে যায় যাতে তাদেরকে পরস্পরের আত্মীয় বলে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না।

গনেশ (The Mystic Masieur) থেকে র‍্যালফ সিং (The Mimic Men) হয়ে অধুনা সমারসেট চন্দ্রন পর্যন্ত তাঁর উপন্যাসে যে চরিত্রের মিছিল তাদের একটা বড় অংশের আদি উৎস ভারত, পরবর্তীকালে যারা উচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে গেছে পৃথিবীর দূর দূরান্তর প্রান্তে আর জীবনভোর বয়ে এসেছে সাংস্কৃতিক স্থানচ্যুতির যন্ত্রণা, আত্মপরিচয় (identity) সংকটের অস্থিরতা, প্রথম নায়ক গণেশের পিছনে লম্বা সারিতে দাঁড়িয়ে এই রকম অসামান্য সামান্য মানুষেরা — The Suffrage of Elvira (১৯৫৮)-র উচচাকাঙ্ক্ষী ভোটপ্রার্থী হরবন্শ্ ও গ্রাম্য বুদ্ধিজীবী লরখুর ; Miguel Street (১৯৫৯)-এর

প্রথম পুষ কথক ও আরো সব রাস্তার মানুষ—যারা তাদের প্রান্তিক অস্তিত্বের কমেডি ও বিষাদ- এর মূর্ত ছবি; A House for Ms Biswas (১৯৬১)-এর মোহন (যার সঙ্গে নাকি লেখকের বাবার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়)—অল্পশিক্ষিত 'ত্রিনিদাদ ভারতীয়ে'র সীমিত জীবন ও সুযোগের মধ্যে যাকে নিরন্তর ভাগ্যের মোকাবিলা করতে হয় ; The Mimic Men (১৯৬৭)-এর র‍্যালফ সিং—ত্রিনিদাদের উপনিবেশ থেকে লন্ডনে ভেসে আসা রাজনৈতিক নেতা—শহরতলী হোটেলে বসে স্মৃতিকথা লেখে—লেখা এখন তার এক ব্যক্তিগত শুদ্ধিক্রিয়া— কারণ, তার অনুভবকে যন্ত্রণা দেয় এর গ্লানিবোধ যে সে তার ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে; In a Free State (১৯৭১)-এর কবি একজন ইংরেজ যে আফ্রিকার পরবাসী; A Bend in the River (১৯৭৯)-এর সালিম—সে এসেছে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল থেকে, কিন্তু তার মতে ও ঠিক আফ্রিকা নয়; একটা " Arab-Indian -Persian-Portugese place"; এও দাবী করে তার পরিবার মুসলিম, কিন্তু " একটা বিশেষ গোষ্ঠী .... আরব এবং উপকূলের অন্যান্য মুসলমানদের চাইতে স্বতন্ত্র। আমাদের আচার আচরণ ও চিন্তাধারায় বরং উত্তরপশ্চিম ভারতের হিন্দুদের সঙ্গে বেশী মেলে কারণ আমাদের আদি উৎস সেখানেই।" এ তালিকায় নবতম সংযোগ উইলিয়াম সমারসেট চন্দ্রন (Half a Life, ২০০১) ভেসে চলে ভারত থেকে লন্ডন থেকে পর্তুগীজ আফ্রিকা, কিন্তু নোঙর ফেলতে পারে না কোথাও। এরা যেন সইদের পরবাসী (exile) প্রতিমার বাস্তব রূপ; Reflections on Exile -এর শেষে সইদ বলছেন ঃ

Exile is never the state of being satisfied, placid or secure. Exile, in the words of Wallace Stevens, is "a mind of winter" in which the pathos of summer and autumn as much as the potential of spring are nearly but unobtainable. Perhaps this is another way of saying that a life of exile moves according to a different calendar, and is less seasonal and settled than life at home. Exile is life led outside habitual order. It is nomadic; decentered, contrapuntal; but no sooner does one get accustomed to it than its unsettling force erupts anew."

সেই অস্থিত-অনিচিত-অস্থির 'শীতার্ত মন' -এর সঙ্গে আমাদের বার বার দেখা হয়ে যায় নইপলের উপন্যাস এবং নিবন্ধেও । 'নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে' যে মানুষ তাঁর শৈল্পিক নির্মাণের কেন্দ্রবিন্দু, যে মানুষ তিনি নিজেও, লেখক তাকেই বারে বারে নানান বিচিত্র অবস্থানের মধ্যে ফেলে দিয়ে দেখেন— যেন উপভোগ করেন তার বিমূঢ়তা, আবার দীর্ণ হন তার ব্যর্থতায়- বেদনায়।

নইপলের বিপুল সাহিত্যকর্মকে এক কথায় সংজ্ঞায়িত করা যায় না। তবু এটুকু বলা যেতে পারে তাঁর বিচিত্র সৃজন উঠে এসেছে এক বেদনার্ত কিন্তু ঐশ্বর্যময় আকুলতা থেকে যার উৎস এক ব্যর্থতায়— পূর্ব পুষের অতীত শিকড় ও নিজের অভিবাসী শিকড়হীনতাকে মেলানোর ব্যর্থতায়। আর সেই ঐশ্বর্যময় ব্যর্থতা বার বার ঝলসে উঠেছে তাঁর 'নির্মাণ'-এ,— যা ভারত নামক মূর্তির (icon) বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ— তির্যক ব্যঙ্গে, উপহাসে, তিক্ততায়, উজ্জ্বল আক্রমণে এবং আবেগে-ভালবাসায়-প্রেমে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com